স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক

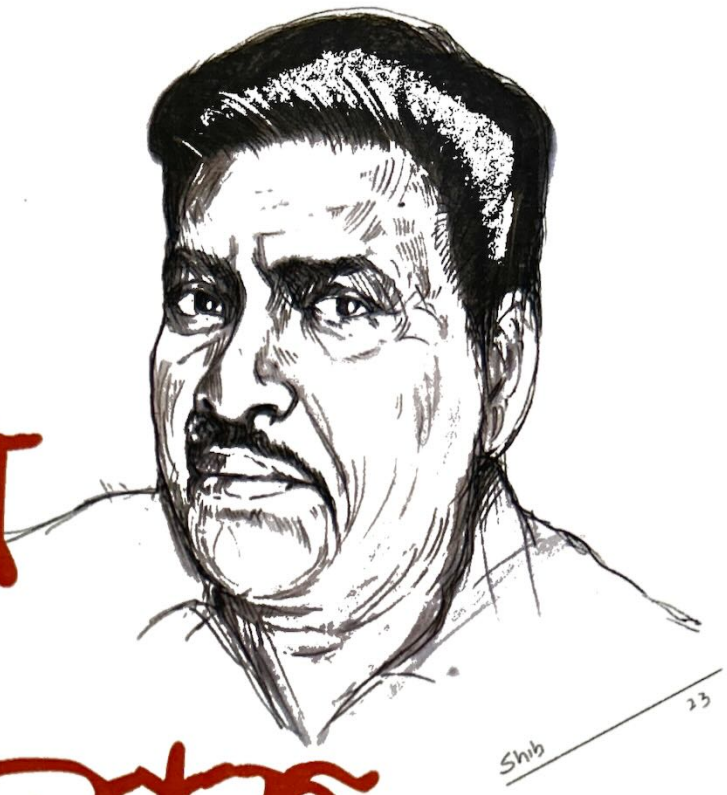

বিভূতিভূষণ : ফিরে দেখা

THE BHAWANIPUR

বাংলা বিভাগ

দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক

বিভূতিভূষণ : ফিরে দেখা

সম্পাদক
ড. কস্তুরী মুখোপাধ্যায়
ড. মিলি সমাদ্দার

THE BHAWANIPUR

বাংলা বিভাগ
দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

STABDHA CHINMAY BHABLOK
BIBHUTIBHUSHAN : PHIRE DEKHA
a collection of Essays

Edited by
Dr. Kasturi Mukherjee
Dr. Mili Samaddar

published by
Bengali Department
The Bhawanipur Education Socity College

ISBN 978-93-92712-44-9

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

প্রকাশক
বাংলা বিভাগ
দি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

পরিবেশক
অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনা

প্রচ্ছদের ছবি : শিব রায়

বর্ণসংস্থাপক ও মুদ্রক : অক্ষরবৃত্ত

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিকস্, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অনুবাদ করতে গেলে লেখক বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বাঙালির সমাজ সত্যের নিরিখে বিভূতিভূষণের ইছামতী
সঞ্চিতা মান্না ১৮৫

পথের পাঁচালী উপন্যাসে অপু ও দুর্গার চরিত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকন্যা পাড়ুই ১৯৪

বিভূতিভূষণের ছোটোগল্প : বিশ শতকের আশাবাদের আরশি
ড: চন্দনা চক্রবর্তী ২০২

বিভূতিভূষণের গল্প : নিম্নবিত্তের জীবন সন্ধান
এম. ডি. বাবুল হোসেন ২১১

"বিনি সুতি মালা গাঁথিছে নিতুই" : বিভূতিভূষণের কথাশিল্প
ড. নির্মাল্য মণ্ডল ২১৯

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : গৌণ চরিত্রের প্রত্যয় ও জীবন-ভাবনা
মোঃ মিসবাহুল ইসলাম ২৩২

দুর্গার পথের পাঁচালী : না হয়ে ওঠার গল্প
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত ২৫৬

বিচিত্রদৃকে পথের পাঁচালী
সৃজন দে সরকার ২৭২

সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে বিভূতিভূষণের
শিশু-কিশোরসাহিত্য : একটি পুনর্মূল্যায়ন
শতাক্ষী কুণ্ডু ২৮৩

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্যচর্চা ও অনুবাদকর্মের অনুষঙ্গ
সুখেন্দু দাস ২৯৫

বিভূতিভূষণ ও শোলখভ : তুলনামূলক আলোচনায় দুই সাহিত্যিকের উপন্যাস
পার্থসারথি সরকার ৩০৭

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' এবং সৈয়দ আব্দুল মালিকের
'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
সুচিত্রা বেরা ৩১৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি ৩২৫
লেখক পরিচিতি ৩৩১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' এবং সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

সুচিত্রা বেরা

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। প্রকাশের পর থেকেই এই উপন্যাস ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এই ব্যাপকতা এতটাই ছিল যে উপন্যাসটি সমকালীন অসমীয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আমরা শুধু একটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) প্রতিবেশী অসমীয়া সাহিত্যে কীভাবে গৃহীত হয়েছেন, তা বোঝার চেষ্টা করব।

আমরা সৈয়দ আব্দুল মালিকের (১৯১৯-২০০০) 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'র সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারি। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে অর্থাৎ 'ইছামতী'-র প্রায় এক দশক পর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৈয়দ আব্দুল মালিক বিভূতিভূষণের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দুটি উপন্যাসেই নদীর পারিপার্শ্বিক জীবন, সমাজ ও মানুষের কথা উঠে এসেছে। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'র নদীকেন্দ্রিক ভাবাবেগ কীভাবে প্রতিবেশী অসমীয়া সাহিত্যের ধনশিরির স্রোতে এসে মিশেছে তার অধ্যয়নই আমাদের আলোচ্য। মূলত তিনটি বিষয় আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব :

(ক) উপন্যাসের পটভূমি
(খ) চরিত্র
(গ) শৈলি।

পটভূমি :

উপন্যাসের পটভূমি বলতে সাধারণত বোঝায় ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে উপস্থাপিত স্থান, কাল, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রবহমান সমাজ। কোনো একটি

বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ শ্রেণীর মানুষের নিত্য জীবনযাপন, নাগরিক বা পল্লী জনজীবন—ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিষয় উপন্যাসের পটভূমি রচনা করে। সাধারণত দুটি দিক থেকে এই পটভূমি দেখানো যেতে পারে : (ক) প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো একটি বা একাধিক চরিত্রের সাধারণ জীবন, এবং (খ) প্রতিকূল পরিবেশে সেই চরিত্রের জীবন-সংগ্রাম।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুই তার পটভূমি রচনা করে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস দুটির পটভূমি নদীকেন্দ্রিক গ্রামজীবন। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' ইছামতী নদীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আর আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' নাগা পাহাড় থেকে নেমে আসা ধনশিরি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

নদীর তীরে দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান 'সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস'-এর সাক্ষী এই ইছামতী। উপন্যাসের ঘটনাস্থল পাঁচপোতা গ্রাম। মূলত মোল্লাহাটি ও মোল্লাহাটি নীলকুঠিকে নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাসের কাহিনিচক্র। পাঁচপোতা ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণেরাই সমস্ত ব্যাপারের হর্তাকর্তা। শ্রেণি-বৈষম্য এখানে সর্বাধিক।

কিন্তু 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এ ডালিম মুসলমান-প্রধান গ্রাম হলেও এখানে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থেকেছে। এখানে হিন্দু, নেপালি, মিকির (মিচিং) জনগোষ্ঠীর লোকেরাও রয়েছে। গ্রামে মন্দির-মসজিদ দুটোই রয়েছে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার থেকে মানবিকতা এখানে বড় হয়েছে। এখানে ঈশ্বর ও আল্লা, পাথর ও গাছ সকলেই পূজা পায়।

'ইছামতী'র সময় উনিশ শতক অর্থাৎ ১২৭০ বঙ্গাব্দের অখণ্ড বাংলা। দেশজুড়ে তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। বাংলা তখন নীলকর সাহেবদের অধীনে। একদিকে কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রেণির জাতিভেদ প্রথা, আর অন্যদিকে এই নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত পল্লীজীবন। নীলকর সাহেবরা জোরজুলুম করে ক্ষুদ্র চাষিদের জমি নীলের দাগ দিয়ে দখল করত। জমি বেদখল, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, শারীরিক নির্যাতন, লঘু পাপে গুরু দণ্ড, জরিমানা—এ সমস্ত তখনকার দিনে ছিল সাধারণ ঘটনা।

কিন্তু এই বহিরাগতদের কোনো ছায়া ডালিম গ্রামে পড়েনি। ডালিম প্রত্যন্ত গ্রাম, দুনিয়ার আধুনিকতার আলো এখানে প্রবেশ করেনি। বাইরের লোকের যাতায়াত এরা পছন্দ করে না। এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলেরও আনাগোনা এখানে নেই। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক এদের খুব কম। বনবনানীতে ভরপুর সবুজ পল্লীজীবনই এদের পরিচিত।

আর-একটি বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, গ্রামবাংলার সমাজে চণ্ডীমণ্ডপের এক বিরাট মাহাত্ম্য রয়েছে। এখানে দিন থেকে রাত পর্যন্ত "নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা চালে।... জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে...."[১] সুতরাং তাদের ভাবনা নেই। আর এই আলস্য ও নৈষ্কর্ম থেকেই আসে ব্যর্থতা ও পাপ।

এরই ঠিক বিপরীত ছবি দেখতে পাই 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এ। এখানে মানুষ স্বনির্ভর। ডালিম উর্বরা গ্রাম। চাষবাস করে, দুধ বেচে তারা উপার্জন করে। এখানকার মানুষেরা আজকের যুগের, তবু যেন অতি প্রাচীন। নগর থেকে, আধুনিকতার স্পর্শ থেকে এদের বাস অনেক দূরে। সমস্ত গ্রাম জুড়ে রয়েছে এক ঘন অরণ্যের আদিম অন্ধকার।

চরিত্র :

চরিত্র-চিত্রণে বিভূতিভূষণ একজন দ্রষ্টা ও শিল্পী। তিনি ছিলেন গ্রামবাংলার মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই তিনি গ্রামের জনজীবন, তাদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা, সমাজে তাদের অবস্থান — এ সমস্ত কিছু স্বচক্ষে দেখেছেন। আর এসব চরিত্রই বিভিন্ন রূপে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের যে দুর্দশা, বৈষম্যের প্রতি লড়াই তা প্রকাশ পেয়েছে 'ইছামতী'র নালমোহন পাল ওরফে নালুর মধ্যে। সে জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি। পরনির্ভরশীল না থেকে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছে। তাই সে পরিশ্রম করে রোজগার করে নিজের আটচালা ঘর করেছে। সমাজে একজন বিশিষ্টজনের স্থান অর্জন করেছে। এই অদম্য ইচ্ছা ও স্বনির্ভর হওয়ার মনোবল দেখতে পাই আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এও। এখানে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষকের সন্তান কৃষক গুলচ। জীবন-সংগ্রামে রত এক সাধারণ গ্রাম্য যুবক। ডালিম গ্রামে কেউই বসে খায় না। যুবক-যুবতী থেকে বৃদ্ধা-বৃদ্ধা সকলেই কাজ করে খায়। তাই গুলচের মায়ের সম্পর্কে তার উক্তি :

> "মাক ডালিম গাঁওরে ছোয়ালী। বহি খাব নেজানে। পাঁচ বছরীয়ারপরা ভূঁই কঠীয়া করি, খরি ফালি, ঢেঁকী খুন্দি খাইছে। কাম করিবলৈ ভয় নকরে। গাটো ভালে থাকেমানে মাগি নেখাঁও — খাটি খাম।"[২]

গুলচ সবসময় কর্মকে ধর্মের ওপর রেখেছে। এমনকি কাজ করার জন্য সে, কপাহী ও তরা গ্রামান্তরে গিয়েছে। প্রকৃতির মতোই সহজাত গুলচের ক্রোধ,

কোমলতা, ব্যক্তিত্ব আর কল্পনাপ্রবণতা, অদৃষ্টের সম্মুখে নতিস্বীকার কিন্তু অবস্থার বিরুদ্ধে অনমনীয় বিদ্রোহ, মোহ আর উদাসীনতা — জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, কোনো কিছুই কৃত্রিম নয়। তাই কপাহী ও তরা দুজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার চারিত্রিক ত্রুটি লক্ষিত হয় না। এক স্বাভাবিক প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করেছে। এক পর্যায়ে গিয়ে সে অনুভব করেছে যে কপাহী বা চেনিমাই কাউকেই সে জীবনে চায় না। একমাত্র তরাই তার জীবনে রয়েছে। গুলচ ও তরা চরিত্রে লেখক রোমান্টিক ভাবাবেগ আরোপ করেছেন। বন্যায় সমস্ত গ্রাম যখন ভেসে যাচ্ছে, তখন গুলচ তরাকে আঁকড়ে ধরে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে :

> "বান আহিছে, এই বছরের খেতিটো গ'ল আরু। মাহীয়েরো গ'ল, সকলো গ'ল। যাওক, তই আছ — ... তয়েই মোর ঘর, মোর পথার, মোর সকলো —"।[৩]

অথবা

> "গুলচর চকুর আগতে সূরুযমুখী ফুলজোপা থিয় হৈ আছে।.... আরু বেলি তরাই রুইছিল সূরুযমুখীজোপা। মূর-সমনীয়া হ'ল। হঠাতে সি দেখিলে চাই থাকোঁতেই, তার চকুর আগতে সূরুযমুখীর ঢোপা এটা ফট্ করে মুকলি হৈ গ'ল। ঢোপাটো এপাহ ফুল হৈ গ'ল।"

এই রোমান্টিক ভাবালুতা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'-তেও দেখা যায়। ভবানী বাঁড়ুয্যের চরিত্র অঙ্কন করতে লেখক এই রোমান্টিসিজমের অবতারণা করেছেন। ভবানী শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক মানুষ। গ্র্যান্ট সাহেবের ভাষায় 'An Indian Yogi'। দেশ-দুনিয়া বেড়িয়ে আসা ভবানী পাঁচপোতা গ্রামের বুক দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতীকে দেখে মুগ্ধ হন। স্বপ্ন ও কল্পনায় মেশা এই নদী। বর্ষার ভরা ইছামতী দেখে ভবানী বাঁড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন :

> "....কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টিতেই অপরূপ শিল্প! এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্ণে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে, স্থলে, ঊর্ধ্বে, অধে, দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে। যেখানে তিনি সেখানে এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্তবৌরি পাখির হলুদ রঙের দেহে ঝলক ফুটে ওঠে।"[৪]

শৈলি :

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' এবং সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে প্রকৃতি ও সমাজকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে একাকার হয়েছে। মাটির পৃথিবীর অনাড়ম্বর চিত্র অঙ্কনে বিভূতিভূষণ সিদ্ধহস্ত লেখক। স্নিগ্ধ, শান্ত, স্বপ্নময় ইছামতী 'ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প'। এই প্রকৃতিচেতনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে বিভূতিভূষণের সাহিত্যসম্ভারে। 'ইছামতী' তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। এখানে তিনি নদিয়া ও যশোর জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতীর চমৎকার রূপের বর্ণনা করেছেন :

> "সুন্দর বিকেল সেদিন নেমেছিল পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারে। বন্যপুষ্প-সুরভিত হয়েছিল ইষত্তপ্ত বাতাস। রাঙা মেঘের পাহাড় ফুটে উঠেছিল অস্ত আকাশপটে দূরবিস্তৃত আউশ ধানের সবুজ ক্ষেতের ও-প্রান্তে। কিচমিচ করছিল গাঙশালিক ও দোয়েল পাখির ঝাঁক।"[৫]

এই রূপে মোহিত হয়েছিলেন কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট। তাঁর চোখে পল্লীবাংলার দৃশ্য এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীতীরের অপরাহ্ণ বেলায় তিনি 'অনিন্দ্যসুন্দর মহাকবিত্বময় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের' সন্ধান পেয়েছিলেন।

সৈয়দ আব্দুল মালিকের প্রকৃতি-চেতনা প্রখর। অসমের প্রকৃতি ও নানা ঋতুতে এই অঞ্চলের নিসর্গের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এ রূপায়িত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিহিত সম্পর্কের বিষয়টি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। উপন্যাসটিতে ডালিম গ্রামের জনজীবন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। এই একাত্মতার ছবি কাব্যময় ভাষায় চিত্রিত করেছেন লেখক :

> "হঠাৎ নৈখনর ওপরত চকু পরি সি রৈ গ'ল। জরজরীয়া বরষুণজাকর বগা বগা টোপালবোর নৈর পানীর ওপরত সরি পরিছে—অবিরাম। ইমান ধুনীয়া হৈছে। পানীর ওপরত পানীর টোপাল পরিলেও ছিটিকনি ওঠে। বগা, কোমল ছিটিকনি। নৈর পানীবোর পরিষ্কার—প্রায় নীলা। তার ওপরত মেঘর বুকুরপরা নামি আহি পরিছে বরষুণর পানীর বগা বগা ছিটিকনি।"[৬]

এই উপন্যাসে উজান অসমের গোলাঘাট জেলার উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি কিছু আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় :

> "ওঁ এটা মৌলবী বন্দোবস্ত করি থবি। লোকর ছোয়ালীর লগত এনেই ঘর করি থাকিবনেকি? আনি পায়ে মৌলবীর হতুয়াই নিকাহ পঢ়াই লবি।"[৭]

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' নদী ও আকাশ এবং মাটি ও মানুষের আখ্যান। 'মূক জনগণের ইতিহাস' লিখতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন মানুষের সহজাত ভাষা। চরিত্রের মুখের ভাষা লেখকের আত্মপ্রকাশের বাহন। এই উপন্যাসে লেখক নদিয়া জেলার রাঢ়ী উপভাষা ব্যবহার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে :

> "— কি করি বলো। আমরা হলাম গরিব-গুরবো নোক। শ্যামচাঁদ পিঠে বসিয়ে দিলে করচি কি ভাই বলো দিনি। কি বললে সায়েব তোমারে?"[৮]

দুটি উপন্যাসই নদীকেন্দ্রিক। নদী সর্বদা গতিশীল। আর এই গতিশীলতা উভয় উপন্যাসেই পরিলক্ষিত হয়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' অনন্ত পথ চলার কাহিনি। এই গতিচেতনা 'ইছামতী'-তেও দেখা যায়। 'ইছামতী'-র কালপরিধি উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে বিশ শতকের বেশ কিছু সময় জুড়ে রয়েছে। নীলচাষ, নীলবিদ্রোহ, রেললাইন স্থাপন — এসবের মধ্যে দিয়ে পাঁচপোতা অনেকটা সময় অতিক্রম করেছে, অনেক স্মৃতির সাক্ষী পাঁচপোতা ও ইছামতী :

> "...কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, ...কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ... কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। ...ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেছে বড় লোনা গাঙের দিকে, ...মহাসমুদ্রের দিকে।"[৯]

এই কালপ্রবাহ 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'-এ দেখা দিয়েছে অনেক নতুন আশা, নতুন স্বপ্নের সংমিশ্রণে। যেখানে বন্যাবিধ্বস্ত ডালিম গ্রাম আশা করে নতুন দিনের, "বারিষা বান আহিছে, যাব, কিহর ভয়!" আবার তরা ও গুলচ নতুন প্রভাতের স্বপ্ন বোনে, নবজীবনের প্রতি তারা উন্মুখ। জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ঘৃণা ধনশিরির মতোই চির-প্রবহমান। এই গতিচেতনা লেখক এভাবে প্রকাশ করেছেন :

> "নৈর সোঁত নরয় — গতিশীল নদী।
> রাতির সূরুযমুখী পোহরর অন্বেষণ করে।
> জীবন গতিশীল।"[১০]

উপসংহার :

'ইছামতী'-তে বিভূতিভূষণ নদীর পাড়ে বসবাসকারী সমাজের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলের দরিদ্র সমাজের ছবি অঙ্কন করা। উপন্যাসটি পড়লে আমরা এর মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাই যেখানে তিনি পল্লীবাংলার লোকজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক খুব সুন্দরভাবে গয়ামেম, রামকানাই কবিরাজ, রাজারাম রায়েদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন এবং নীলকুঠি ও সাধারণ মানুষের জীবনের যে নিত্য দ্বন্দ্ব তা ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের নিখুঁত লেখনী শৈলীর মাধ্যমে। আবার ঔপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' বিচিত্র বর্ণের এক অনবদ্য সৃষ্টি। জীবনের চিরন্তনতার নিত্যনতুন স্পর্শ লাগা নিটোল সাহিত্য এই উপন্যাস। অসমীয়া গ্রামীণ জীবনের একটি টুকরো যেন নিয়ে এসেছেন লেখক চোখের সামনে। তেমনিই সহজ, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত অথচ গ্রামজীবনের অন্ধকার রাত্রির মতোই দুর্ভেদ্য। নদী ও নারী, কামনা ও ত্যাগকে লেখক এক অপূর্ব শৈলীর মাধ্যমে একত্রিত করেছেন। প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা এবং জীবন্ত ভাষা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৩৭।

২। সৈয়দ আব্দুল মালিক, 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন', স্টুডেন্টস স্টোরস্, গুয়াহাটি, ২০১৬, পৃ. ১৯।

৩। তদেব, পৃ. ১৯১-১৯২।

৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ১৪২৩, পৃ. ১৬০।

৫। তদেব, পৃ. ১৫।

৬। সৈয়দ আব্দুল মালিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৭। তদেব, পৃ. ৮২।

৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৯। তদেব, পৃ. ২৫৬।

১০। সৈয়দ আব্দুল মালিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।